অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। অসমাপ্ত আত্মজীবনী - পলকের চেতনার সঞ্জীবনী ।।

কার্জন হলের সামনের খোলা মাঠটায় বন্ধুদের সাথে আড্ডা শেষ করে বাড়ী ফিরেছে পলক। পলকের আজ মনটা ভাল নেই। প্রিয় বন্ধু গুলোর সঙ্গে রাগারাগি হট টক সবই হলো তা প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। কেন এমনটা হলো? বিষয়টা সেই তেলেঘুঁটো রাজনীতি। বিএনপি বনাম আওয়ামী লীগ। এসব নিয়ে আর কত? শেখ মুজিবুর রহমান না জিয়াউর রহমান। দুই রহমানকে নিয়ে টানাটানি অথচ দুজনের কেউ বেঁচে নেই। আমি জিয়াউর রহমানকে ভালবাসি তাতে ওদের কী। আমি বিএনপিকে পছন্দ করি তাতে ওদের সমস্যাটা কোথায়? ওরা বললো আমার জানার মধ্যে নাকি একটা গ্যাপ আছে। হাতে একটা বই ধরিয়ে দিলো রায়হান। বললো বইটা পড়িস দেখিস তোর চোখ খুলে যাবে।

বন্ধুদের কেউ কেউ হলে থাকে। পলক থাকে উত্তরায়। রায়হানও বাসায় থাকে - আদাবরে। রাতে খেয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে টেবিলে রাখা রায়হানের দেয়া বইয়ের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে খোলার চেষ্টা করতে করতে ভাবছে কী এমন বই দিলো যা পড়ে চোখ খুলে যাবে। বইটা বের করলো - অসমাপ্ত আত্মজীবনী। লেখক শেখ মুজিবুর রহমান। পলক পড়া শুরু করলো। প্রথমেই ভূমিকা। ... আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময়গুলো কারাবন্দি হিসেবেই কাটাতে হয়েছে। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়েই তাঁর জীবনে বার বার এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ কারাজীবন নেমে আসে। .. .. এই মহান নেতা নিজের হাতে স্মৃতি কথা লিখে গেছেন যা তার মহাপ্রয়াণের উনত্রিশ বছর পর হাতে পেয়েছি .. .. ..।

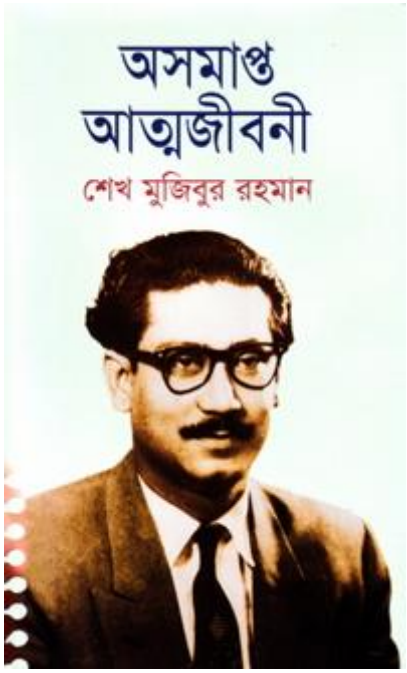

ভূমিকাটি লিখেছেন লেখকের কন্যা শেখ হাসিনা। প্রায় চার পৃষ্ঠা জুড়ে এই ভূমিকা। ভূমিকার পরেই লেখক শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আত্মজীবনী শুরু করেছেন .. .. বন্ধুবান্ধবরা বলে 'তোমার জীবনী লেখ। সহকর্মীরা বলে, রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলি লিখে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আমার সহধর্মিনী একদিন জেলগেটে বসে বলল বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী। বললাম লিখতে যে পারি না, আর এমন কী করেছি যা লেখা যায়। আমার জীবনের ঘটনা গুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুইতো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।

এক টানে ২৮৮পৃষ্ঠার আত্মজীবনী পড়ে ফেললো পলক। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো এ কি করে সম্ভব। গ্রাম থেকে উঠে আসা একটা মানুষ কেমন করে একটা জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখালেন? স্বাধীনতা এনে দিলেন। শৈশব থেকেই তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। শৈশবে মূলতঃ একজন বিপ্লবী গৃহ শিক্ষকের কাছেই নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জন্য কাজ করার হাতেখড়ি তাঁর। কিশোর মুজিব যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন

মারাত্মক এক চক্ষুরোগে আক্রান্ত হলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া স্থগিত থাকে প্রায় তিন বছর। সে সময়ে গৃহ-শিক্ষক হিসাবে হামিদ মাস্টার নামে পরিচিত ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবী কর্মী তাঁর লেখা-পড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হামিদ মাস্টারের কাছে বিপ্লবীদের ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের নানা রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডের কথা কিশোর মুজিব মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। তাঁর মাঝে ক্রমশঃ দেশপ্রেম জেগে ওঠে। কিশোর মুজিব তখন থেকেই নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের সেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। হামিদ মাস্টার ছিলেন মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দীক্ষাগুরু। হামিদ মাস্টারের নেতৃত্বে কিশোর মুজিব গড়ে তুললেন একটি সেবামূলক সংগঠন। সংগঠনটির উদ্যোগে প্রতিদিন স্বচ্ছল বাড়িগুলো থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করে 'ধর্ম-গোলা' নামে একটি সঞ্চয়-ভাণ্ডার গড়ে তোলা হতো। সঞ্চিত ধান-চাল-অর্থ দান করা হতো নিঃস্ব মানুষদের। জনসেবার এ মহান ব্রতটি বালক বয়সেই মুজিব শিখেছিলেন গৃহ-শিক্ষক হামিদ মাস্টারের কাছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে মুজিব তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে নিজেদের ধানের গোলা খুলে দিয়েছিলেন দূর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য।

১৯৩৮ সালে পূর্ব-বাংলার মূখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং বাণিজ্য ও পল্লী-উন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ শহরে এসে মিশন স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তখন কংগ্রেস কর্মীরা মন্ত্রীদ্বয়ের সফরের বিরোধিতা করলে তরুণ মুজিব তাঁর বন্ধুদের নিয়ে স্কুলে মন্ত্রীদ্বয়কে সংবর্ধনা জানাবার কাজে অংশ নেন এবং কোন এক সুযোগে সাহস করে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীদ্বয়ের কাছে স্কুল হোস্টেলের ভাঙা ছাদ মেরামতের দাবি জানান। মন্ত্রীদ্বয় তরুণ মুজিবের এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হন এবং স্কুল হোস্টেলের ছাদ মেরামতের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করেন। সেসময়ের প্রেক্ষাপটে তরুণ মুজিবের এই সাহসকে দুঃসাহস আখ্যায়িত করা হয়। উপস্থিত সকলে তাঁর এই সাহসে স্তম্ভিত হন - বলেন একে দিয়েই হবে। এই একটি ঘটনা তরুণ মুজিবকে আরো সাহসী এবং নেতৃস্থানীয় করে তোলে। তরুণ মুজিব হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা।

১৯৪২ এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্যের মর্যাদা লাভ করেন। কলেজের বেকার (Baker) হোস্টেলে অবস্থানকালে সর্বস্তরের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং তিনি হোস্টেলের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর থেকেই তাঁর নেতৃত্বের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। একই বছর তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সনে অর্থাৎ দেশ বিভাগের বছর মুজিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার সময়ে কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এসময় মুজিব মুসলমানদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন।

ভারত-পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠা করেন পূর্বপকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এ সময়ে ভাষা আন্দোলনে সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহুত ধর্মঘটে অংশ নেবার কারণে শেখ মুজিব গ্রেফতার হন ও পরে মুক্তি পান। এ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দানের কারণে দ্বিতীয়বার জেল গেটে গ্রেফতার হন।

১৯৪৯ সনের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলো। কারাবন্দী শেখ মুজিব নির্বাচিত হলেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক পদে। ১৯৫৩ সনের ৯ জুলাই পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি নির্বাচিত হলেন দলের সাধারণ সম্পাদক।

এর মাঝে ঘটে গেছে অনেক কিছু। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৭ কাগমারী সম্মেলন যেখানে মওলানা ভাষাানী আওয়ামীলীগের সভাপতি থেকে পদত্যাগ করলেন এবং আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ হলেন নতুন অস্থায়ী সভাপতি। ১৯৫৮ তে সামরিক আইন জারি এবং শেখ মুজিব আবার কারাগারে। ১৯৬২ তে মুক্তি লাভের পর আইউব বিরোধী আন্দোলন। সেখানেও নেতা শেখ মুজিব। ১৯৬৮ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। আবারও তাঁর জেল। তাঁর মুক্তি হয় আবার জেল গেট থেকেই পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৭০ সালে মুজিব পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন আর তাজউদ্দীন হলেন দলের সাধারণ সম্পাদক। তারপর নির্বাচন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়। তারপরে তো একাত্তর। সাতই মার্চ্চ সমগ্র বাঙালি জাতিকে বলেদিলেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এবার পলক ডুবে যায় নিজস্ব ভাবনায়। অনেকে বলে তিনি ২৫ শে মার্চ্চ পাকসেনাদের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন।

এখন ও বুঝতে পারে তিনি কেন অন্যত্র পালিয়ে যাননি? তিনি না স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন? তিনি তো তাঁর জীবন বাজি রেখেই আজীবন লড়েছেন। বীর কখনো যুদ্ধে নেমে পালিয়ে যায়? নিজ বাহিনীকে যা যা নির্দেশ দেবার দিয়ে ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এসো যুদ্ধ আমার সাথেই করতে হবে । কথা আমার সাথেই বলতে হবে।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ্চ অতি সাধারণ ঘরে জন্ম নেয়া অসাধারণ এক মানুষ যিনি শৈশব থেকেই নির্যাতিত নীপিড়িত মানুষের মুক্তির জন্য লড়তে গিয়ে পঞ্চান্ন বছরের ছোট্ট জীবনটাতে বত্রিশ বছর টানা সংগ্রাম আন্দোলন করেছেন। বাইশবার হয়েছেন কারাবাসী তিনি কী না পালিয়ে যাবেন?। তিনি শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে ৬ দফার আন্দোলন, স্বাধিকারের আন্দোলন শুরু করলেন তারপর স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ। গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সমতা আনতে বাকশাল গড়লেন। এর সুফল পাওয়ার আগেই তাঁকে হত্যা করা হলো। না দেখে না বুঝেই তাঁর ঘাড়ে বাকশালের অপবাদ তুলে দেয়া হলো। এবং গোটা পরিবার নিয়ে সবশেষে নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেলেন। দিয়ে গেলেন সব। কী দিয়েছেন তিনি? দিয়েছেন বাঙালি জাতির মুক্তি, বাঙালির জন্য স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ যে দেশের মানুষকে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। ভীষণ।

রাত প্রায় শেষের দিকে। পলক ভাবলো আরে এ মানুষটার জন্ম নাহলে তো এদেশটাই ওর হতো না। ও যাকে নেতা মানে তাঁর আগমন তো আকস্মিক। অবদান তো সাময়িক। নাহ্ আমাকে আরো জানতে হবে আরো বুঝতে হবে।

এমন ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লো পলক। সকালে রায়হানকে একটা ফোন দিলো। বললো অনেক ধন্যবাদ দোস্ত বইটার জন্য। আমি আরো জানতে চাই। পনেরোই আগষ্টের আলোচনা সভায় আমায় নিয়ে যাবি? আমি আরো জানতে চাই। এতোদিন না জেনে যা করেছি বুঝেছি এবার জেনে শুনে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। জয় বাংলা।

জয় বঙ্গবন্ধু।